খেলাপি ঋণ আসলে কমেনি!

পাঁচ বছরের পুরনো ঋণ অবলোপন করার ফলে এক বছরে ব্যাংকিংখাতে খেলাপি ঋণ ১৫% কমেছে। কিন্তু এটা শুধু কাগজে-কলমে। ...লিখেছেন আসজাদুল কিবরিয়া

কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। নানা রকম কঠিন বিধি-বিধান করে দেয়ার পরও দেশের ব্যাংকিংখাতে খেলাপি ঋণের দৌরাত্ম্য যেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলই। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বাড়াচ্ছিল রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ঋণ গ্রহণকারীরা আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। অন্যদিকে বেসরকারি খাতে ব্যাংকের পরিচালকরা নামে-বেনামে ঋণ নেওয়ার মজা পেয়ে বসেছিল। পুনঃতফসিল বা ঋণ নবায়ন করার সুযোগ দিয়েও ঋণ আদায়ে তেমন কোনো সুফল পাওয়া যায়নি। আর যাবেই বা কিভাবে? ইচ্ছা করে খেলাপি হতে চাইলে এবং খেলাপি হওয়ার পর ঋণ ফেরত না দিয়ে বছরের পর বছর মামলা চালিয়ে যেতে চাইলে আর যাই হোক ব্যাংক কখনো ঋণ সময়মতো ফেরত পাবে না।

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অবশেষে গত বছরের (২০০৩) জানুয়ারি মাসে এক নতুন নির্দেশনা জারি করে। এই নির্দেশনায় ব্যাংকগুলোকে পাঁচ বছর বা তারচেয়ে পুরনো ঋণগুলোর হিসেব আলাদা করতে বলা হয় হিসাববিজ্ঞানের ভাষায় যা 'অবলোপন' বা 'রাইটঅফ' হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যাংকগুলো অবলোপন পদ্ধতির চর্চা করে আসছে অনেক দিন থেকেই। এই অবলোপন করার মানে হলো, ব্যাংকগুলো পাঁচ বছরের পুরনো ঋণের হিসেব ব্যাংকের মূল হিসেব থেকে এমনভাবে আলাদা করে রাখবে যেন ব্যাংকের নিয়মিত হিসাব বিবরণীতে এগুলো আর না দেখানো হয়। এতে করে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য একই সঙ্গে এই বলে দিয়েছিল যে অবলোপন করার মানে এই ঋণগুলো মওকুফ করে দেয়া নয়। বরং অবলোপন করার আগে প্রত্যেক খেলাপির বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা করতে হবে এবং ঋণ আদায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য ব্যাংকগুলোকে আলাদা অবলোপন বিভাগও খুলতে হবে।

অবলোপন পদ্ধতি চালু করার প্রায় এ বছর পর ব্যাংকিংখাতের খেলাপি ঋণের সামগ্রিক চিত্রটি তাহলে কী দাঁড়িয়েছে? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেব থেকে জানা যায় ২০০৩ সালে ব্যাংকিংখাতে খেলাপি ঋণ পূর্ববর্তী ২০০২ সালের তুলনায় প্রায় ১৫% কমেছে। খেলাপি ঋণের এই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস অবশ্য ঋণ আদায় নয়, ঋণ অবলোপনের কারণে সম্ভব হয়েছে। কারণ, গত বছর ব্যাংকগুলো মোট ৪,৫০০ কোটি টাকা অবলোপন করেছে। নিন্দুকরা অবশ্য সমালোচনা করে বলছেন যে যতোই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতির কথা বলা হোক না কেন খেলাপি ঋণ আসলে কমেছে কাগজে-কলমে। বকেয়া বা খেলাপি ঋণ কতোটা আদায় হয়েছে সেটা পর্যালোচনা না করলে এই ঋণ কমা নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। ব্যাপারটা বোধহয় আসলেও তাই। তা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুনভাবে ব্যাংকগুলোকে বিশেষ করে চার রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন নির্দেশ দেবে খেলাপি ঋণ আদায়ে আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার জন্য। বিশেষ করে এসব ব্যাংকের শীর্ষ ৮০ জন খেলাপির কাছেই ব্যাংকগুলোর মোট খেলাপি ঋণের ৩০% আটকা পরে আছে। বছরের পর বছর চেষ্টা করেও এসব আদায়ে তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না। গতবছরই চার ব্যাংক মিলে এসব শীর্ষ খেলাপিদের কাছ থেকে সর্বসাকুল্যে মাত্র ১৬ কোটি টাকার কিছু বেশি উদ্ধার করতে পেরেছে।

খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়ে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত চার বাণিজ্যিক ব্যাংক ও উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের। আর হবেই বা না কেন? একদিকে সরকারি ব্যাংক বলে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন সময়ে ঋণ দিয়ে আসতে হচ্ছে এই ব্যাংকগুলোকে। সরকারি নির্দেশ থাকে বলে ঋণের প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা যাচাই বাছাই করার সুযোগ থাকে না বললেই চলে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ঋণ ক্রমেই খেলাপি হয়ে ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে এসব ব্যাংক

খেলাপি ঋণ চালচিত্র ২০০৩

ব্যাংক	মোট ঋণ (কোটি টাকায়)	খেলাপি ঋণ (কোটি টাকায়)
সোনালী	১৪,৫৪৬.৫৬	৪,৯৫৮.৫৫
জনতা	৯,৪৭০.৬৯	২,১৯৯.৬০
অগ্রণী	৮,৩৭৩.৪৯	২,৬৪১.১৬
রূপালী	৪,০২০.৮৬	৭৬৯.৬৩
৪ সরকারি ব্যাংক	৩৬,৪১১.৬১	১০,৫৯৬৮.৯৪
৩০ বেসরকারি ব্যাংক	৩৯,০৩৬.৬৩	৪,৮৬১.৪০
১১ বিদেশী ব্যাংক	৬৪০৬.৭৪	১৭১.৫৫
৫ উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৯,৯৭২.৫১	৪,৭২৭.৬৪
সর্বমোট	৯১,৮২৭.৪৮	২০,৩১৯.৫৩

ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। যেমন, সোনালী ব্যাংকের শীর্ষ খেলাপি এখন বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় যারা মোট ৪১৪ কোটি টাকার ঋণ খেলাপি। এই ঋণ আদায় করা কতোটা সম্ভব হবে সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকেরই।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব থেকে আরো জানা যায় যে ২০০৩ সালে দেশে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২০,৩১৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। তার আগের বছর ২০০২ সালে এই পরিমাণ ছিল ২৩,৯৬২ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পুরনো খেলাপি ঋণ অবলোপন করা সত্ত্বেও অনেক ব্যাংকেই নতুন

সোনালী ব্যাংকের শীর্ষ খেলাপি এখন বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় যারা মোট ৪১৪ কোটি টাকার ঋণ খেলাপি। এই ঋণ আদায় করা কতোটা সম্ভব হবে সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে অনেকেরই

ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছে। তার মানে হলো, খেলাপি ঋণ পরিস্থিতির আসলে কোনো উন্নতি হয়নি। যেটুকু হয়েছে সেটুকু ঐ নিন্দুকদের ভাষায় 'কাগুজে' অগ্রগতি। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিংখাত সংশ্লিষ্ট লোকজন এহেন কথায় যারপর নাই ক্ষুব্ধ হবেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো আর অতো হিসাবী মারপ্যাচ বোঝা সম্ভব নয়। তারা বরং পাল্টা এই প্রশ্ন করতেই পারেন যে খেলাপি ঋণ কমে গিয়ে থাকলে পুরোনো যেসব ঋণের হিসেব আলাদা করা হয়েছে সেগুলো আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে কেন? বলা হয়েছে এজন্যই যে ঐ ঋণগুলো আসলে মাফ করা হয়নি।

অবলোপনের ফলে বাহ্যিকভাবে সবচেয়ে বড় যে লাভ হয়েছে, সেটা হলো ব্যাংকগুলোর আর্থিক হিসাব বিবরণী থেকে খেলাপি ঋণ (যা ব্যাংকের ভাষায় শ্রেণী বিন্যাসকৃত ঋণ) কমে গেছে। এতে করে ব্যাংকগুলোর আর্থিকভিত্তি আগের চেয়ে খানিকটা শক্তিশালী হিসেবে দেখানো সম্ভব হবে। ব্যাংকের প্রতি ঋণ গ্রহীতা ও আমানতকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। আর সে কারণেই বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অবলোপন পদ্ধতি চালু রাখা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাছাড়া মাত্র এক বছরের ফলাফল দেখে চূড়ান্ত কোনো মতামত দেয়া যায় না। আরো কয়েক বছর পর ব্যাংকিখাতের খেলাপি ঋণের চিত্র ও প্রবণতাই বলে দেবে অবলোপন পদ্ধতি কতোটা সুফল বয়ে এনেছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

নিয়ম লঙ্ঘন করে পদোন্নতি

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত নামে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে, যার কাজ চূড়ান্ত বিচারে মানুষকে হয়রানি করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর হয়রানি করার জন্য যেসব গুণ প্রয়োজন সেগুলো হলো অদক্ষতা ও দুর্নীতি। সরকারের আর দশটি মন্ত্রণালয়ের মতো এই মন্ত্রণালয় এবং এর সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো দুর্নীতিমুক্ত নয় মোটেও। বরং নিত্য নতুন দুর্নীতির জন্ম দেয়ায় এরা যেন পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। হালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র প্ল্যানার (ঊর্ধ্বতন পরিকল্পনাবিদ) পদে চারজন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা এই ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, সিনিয়র প্ল্যানার পদে সরাসরি নিয়োগ কিংবা পদোন্নতি দিতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অবশ্যই নগর পরিকল্পনা কিংবা আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। এর সঙ্গে আরো কয়েকটি বিকল্প যোগ্যতাও থাকতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়ে একাডেমিক ডিগ্রি আবশ্যক। অথচ নগ্নভাবে এই নিয়ম ভঙ্গ করে ভিন্ন পেশার ও ভিন্ন ডিগ্রিধারী চারজনকে সিনিয়র প্ল্যানার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের একজন প্রকৌশলী, একজন সমাজবিজ্ঞানী, একজন ভূগোলবিদ এবং একজন অর্থনীতিবিদ। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এই চার কর্মকর্তাকে উদ্বৃত্ত কর্মকর্তা হিসেবে অতীতে বিভিন্ন জায়গা থেকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে আত্মীকৃত করা হয়েছিল। নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে উল্লিখিত চার পেশা থেকে বা চার বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা সিনিয়র প্ল্যানার পদে কেবল তখনি নিয়োগ পেতে পারেন যদি তাদের এসব ডিগ্রি বাদেও নগর বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের এন্ট্রি লেভেলের নাম জুনিয়র প্ল্যানার। এরপর ধাপে ধাপে সিনিয়র প্ল্যানার, তার ওপরে উপ-পরিচালক এবং সর্বোচ্চ পদে পরিচালক (যা আসলে হওয়া উচিত চিফ প্ল্যানার)। এই চারটি পদের সবগুলোই নগর বা আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদ পদ এবং এর কোনোটিতেই নগর পরিকল্পনায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছাড়া নিয়োগ দেওয়ার কোনো বিধান বা সুযোগ নেই।

নিয়ম লঙ্ঘনজনিত এহেন পদোন্নতি নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদ হিসেবে কর্মরত পেশাজীবীদের দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশ করেছে। এই বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরাও শঙ্কিত হয়ে পড়ছে যে, এরকম অনিয়ম অব্যাহত থাকলে ডিগ্রি নিয়ে পাস করে বেরিয়ে তারা সরকারি চাকরিতে সুযোগ পাবে না। কারণ, একটি সুনির্দিষ্ট টেকনিক্যাল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও তাদের এখন ভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের সঙ্গে সরকারি চাকরিতে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ প্ল্যানার্স (বিআইপি) এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা বিভাগ পৃথক পৃথকভাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর চিঠি দিয়ে এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করা হলে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক সিকান্দার আলি জানান, 'বিষয়টি মূলত মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত।' এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।